



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 710-717

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.498



বিশ্বদেব চোরাবালি: আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বিক রূপান্তর

ড. বন্দনা বর্মণ, সহকারী অধ্যাপক, করিমগঞ্জ কলেজ, শ্রীভূমি, অসম, ভারত

Received: 25.12.2025; Accepted: 10.01.2026; Available online: 31.01.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

This paper explores the synthesis of myth, modernity, and tradition in Bishnu Dey's seminal poetry collection Chorabali. Moving beyond the conventional view of myth as mere ancient folklore or supernatural tales, the study positions myth as a repository of collective human consciousness and reality—what Rabindranath Tagore described as “ancestral tales embedded in the marrow.” In post-Tagore Bengali poetry, Bishnu Dey stands out for his conscious, objective, and multifaceted application of both Eastern (Indian) and Western classical mythologies to articulate the socio-psychological dilemmas of the interwar era.

Through a close textual analysis of key poems such as Cressida, Ophelia, and Yayati, the article highlights how Bishnu Dey seamlessly weaves classical European literary figures (from Homer, Chaucer, Shakespeare, and Henryson) with Indian epic motifs from the Mahabharata, Ramayana, and the Upanishads. In Cressida, the parallel alignment of the Trojan War and the Kurukshetra War acts as a trope for wartime disillusionment and ultimate intellectual transcendence. In Ophelia, the juxtaposition of Hades and Proserpina alongside Devayani symbolizes the struggle against existential alienation and the search for spiritual redemption through love. Similarly, in Yayati, the mythic king's greed for youth represents the decay of bourgeois capitalism depleting the future generation. Ultimately, the paper demonstrates how Bishnu Dey redefined modern Bengali poetry by using myth not as an escape into the past, but as a dialectical instrument to navigate contemporary realities and achieve a collective humanistic awakening.

Keywords: Bishnu Dey; Chorabali; Myth and Modernity; Bengali Poetry; Classical Mythology

সভ্যতার আদি কালে অজস্র প্রাকৃতিক সংগঠন ও নানা পার্থিব বিষয়ের ব্যাখ্যা আমাদের আদিম পিতামহদের সংস্কার ও বিশ্বাসে মন্ডিত হয়ে যেভাবে রূপ লাভ করত সেই রূপ তথা ব্যাখ্যানগুলিকেই বলা হয় মিথ বা ‘লোকপুরাণ’। পরবর্তীকালে অবশ্য মিথ বলতে মনে করা হয় বাস্তব বিরহিত পুরাকালের কিছু অলৌকিক কাহিনীকেই। আর সেজন্যেই মিথ ও রিয়ালিটিকে পরস্পরের বিপরীত অর্থবাহী বলে গণ্য করা হয়। অথচ মিথ বা লোকপুরাণ যে প্রেক্ষিতে গড়ে উঠুক না কেন তার মধ্যে অন্তর বিলিন হয়ে থাকে মানুষের মানস লোকের সুগভীর কতগুলি বাস্তব প্রতিতি। তাই আপাত দর্শনে মিথ যতই অবাস্তব অলৌকিক অসম্ভাব্য বলে মনে হোক

না কেন তারই গভীরে লুকিয়ে থাকে রিয়ালিটি তথা বাস্তবের অজস্র অভিজ্ঞানের রেনু। আর বাস্তবের স্পর্শ থাকে বলেই সময়ের পরিবর্তনে মিথের রূপ পরিবর্তিত হলেও তার অভিঘাত কাল থেকে কালান্তরে মানুষের অন্তর্লোকের গভীরে অনিবার্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে সঞ্চিত হয়ে থাকে। যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে 'মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহের কাহিনী'। আর এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের অবচেতনের ডাকে সাড়া দেন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বারবার। তাই পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটতে দেখা যায় বারবার বিভিন্ন লেখকের হাতে। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি লেখকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

বাংলা সাহিত্যে মিথের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত রাধা-কৃষ্ণ মিথের মাধ্যমে। তারপর কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কবিরাজ মিথকে ব্যবহার করেছেন। আধুনিককালে মিথকে প্রথম সবচেয়ে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন মধুসূদন দত্ত। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রোত্তর যুগে নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিগণ তাদের কবিতায় ব্যাপকভাবে মিথের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। অবশ্য এই পুরাণ ঐতিহ্য কখনো প্রাচ্য মূলত ভারতীয়, কখনো পাশ্চাত্য আবার কখনো প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ। ভারতীয় পুরাণ ঐতিহ্য প্রয়োগ ব্যতীত গ্রীসিয়, রোমক, ইজিপশিয়ান মেক্সিকান, চৈনিক, জাপানী প্রভৃতি পুরাণ প্রয়োগে বাংলা কবিতা হয়েছে সমৃদ্ধ। অবশ্যই সেখানে আধুনিক কালের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরনো মিথগুলোকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় কবি বিষ্ণু দে পুরাণ ও মিথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তিনি অতীত থেকে অর্জিত পুরাণকে ছব্ব অন্ধ অনুকরণে ব্যবহার না করে, তার প্রচলিত কাঠামো ভেঙে আধুনিক সময়ের সংকটের আলোকেও পুনর্নির্মাণ করেছেন।

“রবীন্দ্রোত্তর কালের আধুনিক কবিদের মিথ ব্যবহারে বিষ্ণু দে স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিভা। দুই যুদ্ধোত্তর অভিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, তীব্র যুগচেতনা, যুগ যন্ত্রনা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত হয়ে সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসা রূপায়ণের জন্য বিষ্ণুদে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মিথেরই আশ্রয় গ্রহণ করে আপন কবি প্রতিভার মুক্তির ঘটাতে চাইলেন।”^১

গ্রীস, রোম, চীন থেকে শুরু করে হিস্পানি, টিউটোমিক প্রভৃতি পুরাবৃত্তের সংকেতও তার লেখায় পাওয়া গেছে। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যময় পুরাণ বৃত্তের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী মিথের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন; এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। প্রচলিত পুরাণ সংস্কারকে অতিক্রম করে সিদ্ধ রস বিরোধিতায় মধুসূদনের যথার্থ উত্তরসূরী হয়ে উঠেছেন তিনি। বিষ্ণু দে'র মিথ পুরাণের গ্রন্থিবন্ধন প্রসঙ্গে চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত বলেছেন---

“বিষ্ণুদে অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ এর মতন একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতিকে মিথের সাহায্যে লুকিয়ে রেখে কবিতা লেখেননি; বুদ্ধদেবের মত মিথের কাঠামোর মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখেও সেই বন্ধনের প্রাচীর কে ভাঙতে ভাঙতে অস্থির হননে অথবা জীবনানন্দের মতো অবচেতনের অনুভব স্পন্দিত করার জন্য মিটকে ব্যবহার করেননি। বিষ্ণুদেব মিথের ব্যবহার নিজস্ব তার ভূগোলকে অতিক্রম করে বহুজনীন, বন্দীত্বের প্রাকারকে ভেঙে প্রমুক্ত এবং অবচেতনের অভিভবকে পেরিয়ে এসে সচেতন প্রয়োগে সুপটু।”^২

কবি তাঁর 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে দেশি-বিদেশি মিথ ও পুরাণকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। এর প্রতিফলন দেখা যায় 'চোরাবালি, কাব্যগ্রন্থের' 'ক্রেসিডা,' 'ওফেলিয়া,' 'যযাতি,' 'মহাশ্বেতা,' 'ঘোড়সওয়ার,' 'টপ্পা-ঠুংরী,' প্রভৃতি কবিতায়।

'ক্রেসিডা' কবিতায় একই সঙ্গে ট্রয় যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামকে মিলিয়েছেন কবি। আপাত বিষমতা সত্ত্বেও নারীকে উপলক্ষ করে সংগঠিত দুটি মহাযুদ্ধের ভাবএক্যকে বিষ্ণু দে সঠিকভাবেই ব্যঞ্জিত করেছেন।

গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে ত্রেসিডা বা ক্রাইসেইস একটি গৌণ চরিত্র। তিনি ট্রয়ের নিকটবর্তী 'ক্রাইসি' নামক স্থানের অ্যাপোলো মন্দিরের পুরোহিত 'ক্রাইসেসে'র রূপবতী কন্যা। ট্রয় যুদ্ধের সময়ে গ্রিকরা তাকে বন্দি করে শিবিরে নিয়ে আসে এবং গ্রিক বাহিনীর প্রধান রাজা অ্যাগামেম্নন তাকে নিজের কাছে রেখে দেন। ক্রাইসেইসের বাবা তাকে ফেরত নিতে চাইলে অ্যাগামেম্নন তা প্রত্যাখ্যান করেন। পুরোহিত পিতার প্রার্থনায় ক্রুদ্ধ হয়ে অ্যাপোলো দেবতা গ্রিক শিবিরে মহামারী পাঠিয়ে দেন। পরে ভবিষ্যদ্বক্তা কলকাসের পরামর্শে বাধ্য হয়ে অ্যাগামেম্নন ক্রাইসেইসকে তার পিতার কাছে ফেরত পাঠান। ক্রাইসেইসকে হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে অ্যাগামেম্নন গ্রীক বীর অ্যাকিলিসের শিবির থেকে 'ব্রাইসেইস' নামের অন্য এক রূপবতী বন্দিদানীকে ছিনিয়ে নেন। এর ফলে অ্যাকিলিস ও অ্যাগামেম্ননের মধ্যে বিখ্যাত বিরোধের সৃষ্টি হয়, যা 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের মূল কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর ইলিয়াদে ক্রাইসেইসের উপস্থিতি আর দেখা যায় না।

'ইলিয়াড'-এ উপেক্ষিত থাকা এই চরিত্রটি মধ্যযুগে বেনোআ দ্য সাঁ মোরের 'রোমাঁ-দ্য-ত্রোয়া' গ্রন্থে প্রথম গুরুত্ব পায়। সেখানে ট্রয় রাজপুত্র ট্রয়লাসের সাথে তাঁর প্রেম এবং পরবর্তীতে গ্রিক বীর দায়োমিদের (Diomedes) সাথে তাঁর সম্পর্কের আখ্যান রচিত হয়। পরবর্তী কালে ইউরোপের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক চরিত্রটিকে নিজেদের সৃষ্টিতে নতুন রূপ দিয়েছেন। যেমন: বোকাচিও'র 'ইল ফিল অস্কোতো', জেফ্রি চসারের 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ত্রেসিস', উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ত্রেসিডা'। মূল মহাকাব্যে ত্রেসিডার চরিত্রটি ভালো বা মন্দে বিচারে নিরপেক্ষ থাকলেও, মধ্যযুগীয় ও রেনেসাঁ সাহিত্যে তাঁকে একজন চঞ্চল ও জটিল চরিত্রের অবিশ্বস্ত নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চসারের কাব্যে প্যাণ্ডারের মাধ্যমে ট্রয়লাসের সাথে ত্রেসিডার পরিচয় ঘটে এবং বীরত্বপূর্ণ প্রেমের সূচনা হয়। পরবর্তীতে পরিস্থিতির শিকারে বাবার কাছে ফিরে গিয়ে তিনি দায়োমিদের অনুরাগী হন, যার ফলে ব্যথিত ট্রয়লাস যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। চসার ও শেক্সপিয়ার উভয়ই ত্রেসিডাকে পরিস্থিতির শিকার ও নিরুপায় এক জটিল নারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

বিষ্ণু দেব 'ত্রেসিডা' কবিতার মধ্যে শেক্সপিয়ার ব্যতীত অন্য কোনো সাহিত্যিকের সার্বিক অনুসরণ দেখা যায় না; তিনি মূলতঃ প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছেন; যেখানে আধুনিক মানসিকতার সাথে ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্য— বিশেষত মহাভারতের প্রাসঙ্গিকতার সংযোজন তাঁর কাব্যভাবনাকে এক জটিল ও অনন্য মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হলেও ট্রাইলাসের জীবনীর ওপর নির্ভর করেই কবিতাটি রচিত হয়েছে। এই পুরাণ প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের মহাযুদ্ধোত্তর সময় পর্বের দ্বন্দ্ব ও বিপন্নতা, শূন্যতা, সংকট, যন্ত্রণা, বিশ্বাসহীনতা সর্বোপরি এক মরুময়তা কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সাযুজ্য রক্ষা করতে গিয়ে ও প্রোটোগনিষ্টের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে ভারতীয় পুরাণ বৃত্তের খন্ড খন্ড চিত্রের উল্লেখ ও করা হয়েছে। যেমন কুরুক্ষেত্র, কঙ্কি, বৈতরণী, ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিৎ, মারীচ, শকুনি প্রভৃতি। বিষ্ণু দেব'র কবিতার পরিকাঠামো মোটামুটিভাবে শেক্সপিয়ারের নাটকের অনুসরণে গড়া হলেও ত্রেসিডার দ্বিচারিতায় শেক্সপিয়ার ট্রয়লাস যেভাবে ঘৃণা ভরে ধিক্কার দিয়েছে—'দুনিয়ার সমস্ত মিথ্যাই তোমার কলঙ্কিত নামের তুলনায় গৌরবময়' সেখানে বিষ্ণু দেব'র ট্রয়লাস অনেক বেশি সংযত। তার প্রতারণিত হওয়া প্রেম তাকে নৈরাশ্য ও ঘৃণার রাজ্যে ডুবে যেতে দেয়নি বরং ব্যর্থ প্রেমিক ট্রয়লাস জীবনের এক প্রকৃত তাৎপর্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছে। ট্রয়লাসের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের মূলে রয়েছে কবির চিন্তার স্বাধীনতা এবং মার্কসবাদ-প্রভাবিত অস্তিত্ববাদী ভাবনার মেলবন্ধন। কবিতাটির ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কবি আপাদমস্তক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পুরাণের অনুষ্ণ এমনকী বেদ উপনিষদ থেকে শব্দ ও পংক্তি তুলে নিয়ে তাকে বিভিন্ন ভাবনার পরিমণ্ডলে ব্যবহার করেছেন। জীবনের আসন্ন সংগ্রাম ও পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ট্রয়লাসের মনে এক অশেষ আশার আলো জেগে উঠেছে—

“স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধুম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।” (ফ্রেসিডা)

কিন্তু প্রেমিক হিসেবে তার ব্যর্থতা, গভীর শূন্যতা ও নিরাশার যন্ত্রণা তাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে, যা তাকে প্রতিনিয়ত পেছনে টেনে ধরছে। ফলে ট্রয়লাস একদিকে তীব্র হতাশা, অন্যদিকে তা থেকে বের হওয়ার চেষ্টার দোলাচলে ভুগছে—

“হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণী পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় চোখ পুড়ে মরে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।” (ফ্রেসিডা)

ট্রয়লাস এমন এক পথিক, যে জীবনের নদী পেরিয়ে নতুন দিগন্তের সন্ধানে ব্যাকুল; কিন্তু খেয়াঘাটে পৌঁছে সে মুক্তির কোনো সন্ধান পায় না। এখানে জীবনের প্রতীক হিসেবে ভারতীয় পৌরাণিক বৈতরণী নদীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ফ্রেসিডা এখন কেবলই তার এক হারানো প্রেমের স্মৃতি, যে ট্রয়লাসের জীবন থেকে তার সমস্ত অনুরাগ নিজের আঁচলে বেঁধে দূরে নিয়ে গেছে। সেই অবিস্মরণীয় প্রেমের স্মৃতি আজও ট্রয়লাসের হৃদয়কে এক গভীর বেদনায় মগ্ন করে—

“দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।
রাত্রিও চাও? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদিঘি কল্লোলে অবিরাম।” (ফ্রেসিডা)

অথচ, ফ্রেসিডার সেই প্রেমঘন স্মৃতি আজও স্মরণ করলে ট্রয়লাসের অন্তরে এক পরম বরাভয় জেগে ওঠে। যে প্রেমের অবিনশ্বর স্মৃতি তার মানসপটে বিরাজমান, সেটাই যেন তাকে জীবনসংগ্রাম পেরিয়ে উত্তরণের নতুন সংকেতে পৌঁছে দেয়—

তোমার বাহুতে অনন্ত -স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
মত্তপ্রলয় তোমাতেই করি জয়। (ফ্রেসিডা)

কিন্তু ট্রয়লাসের এই সর্বসমর্পিত প্রেম সংকটপন্ন হয়ে উঠেছিল—‘হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে’। দেবরাজ জিউসের জারজ কন্যা সুন্দরী হেলেনকে ট্রয়রাজ প্রায়ামের পুত্র প্যারিস অপহরণ করলে গ্রীস ও ট্রয়ের যে বিধ্বংসী দ্বন্দ্ব তারই কালো ছায়া পড়েছিল ট্রয়লাস ও ফ্রেসিডার প্রেমে—‘কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে’ হেলেনের জন্য দীর্ঘ যুদ্ধ রক্তপাত ও তার পরিণতিতে ট্রয়ের পতন ও বিনাশ ফ্রেসিডাকে ট্রয়লাসের প্রেম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এবং তাকে যে দ্বিচারিণী করে তুলেছিল এই বিচ্ছিন্নতা ও প্রেমহীনতাকে বোঝাতে গিয়ে বিষ্ণুদেব কুরুক্ষেত্রের অবতারণা করেছেন—

“কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধুলি
স্বপ্ন গোধুলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে।” (ফ্রেসিডা)

এবং এই দুঃসময় কে বোঝাতে গিয়ে তিনি ভারতীয় পুরাণ থেকে কঙ্কি অবতার প্রসঙ্গের ও অবতারণা করেছেন— ‘মেঘে মেঘে আজ কালো কঙ্কির দিন হলো একাকার।’ কিন্তু এই অন্ধকার ও অস্থিরতার মধ্যেও ফ্রেসিডার প্রেমপূর্ণ স্মৃতিকে ট্রয়লাস মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই সে আজ পথপ্রদর্শক রূপী প্যাণ্ডারকে

খুঁজেছেন। প্যাণ্ডারের উপদেশ ও সাহুনা তাকে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছিল প্রেমের মিলন ও প্রাপ্তিতে — ‘ভবিষ্যহীন আধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার / তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার?’

কিন্তু প্রেমের এই বঞ্চনাকে অতিক্রম করেই ট্রয়লাস এক নতুন পুনরুজ্জীবন ও সম্ভাবনার আলো দেখেছে। যে ক্রেসিডাকে একসময় অবিস্মরণীয় মনে হয়েছিল, সময়ের ব্যবধানে সেই অন্ধকার কাটতেই সে আলোর দিশা পেয়েছে। ব্যক্তিগত প্রেমের অসমাপ্তি কাটিয়ে এক বৃহত্তর ও উজ্জ্বল জীবনের আস্থানেই তার উত্তরণের পথ উন্মোচিত হয়েছে। অলাতচক্রের রূপকে ট্রয়লাস খুঁজে পায় তার অন্তরের দুর্বীর বেগ। ভারতীয় পুরাণের অগ্নিরথ বা ঘূর্ণায়মান বলয়ের এই চিত্রকল্প তার চেতনাকে নবজীবনের আস্থানে উদ্দীপিত করে এবং ফিরিয়ে দেয় হারানো আত্মশক্তি। বিষ্ণু দে-র ট্রয়লাস আজ এমন এক আত্মপ্রত্যয়ী জীবনের মুখোমুখি, যেখানে ক্রেসিডার বঞ্চনার ক্ষুরধার বর্ষাও তাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়—

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে

উদ্বায়ু আজও হয়নি আমার মন

লোকায়ত মোর স্বেচ্ছা বর্মে লেগে

বর্ষা তোমার হয়ে গেল খান্ খান্।। (ক্রেসিডা)

এখানেই বিষ্ণু দে কালোচিত প্রজ্ঞায় শেক্সপিয়ারের নির্দেশ অতিক্রম করেছেন। ট্রয়লাসের চেতনা আজ নির্মল ও নিষ্পাপ। এক প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবনের তোরণে দাঁড়িয়ে সে জনমানুষের যৌথ সত্তায় নিজেকে বিলীন করে খুঁজে পেয়েছে নবজীবনের দিশা; অতীতের বঞ্চনাময় স্মৃতিকে সে আর আকড়ে ধরে রাখতে চায় না।

কবিতার শেষাংশে রবার্ট হেনরিসনের ‘দ্য টেস্টামেন্ট অফ ক্রেসেইড’-এর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। হেনরিসনের ভাবানুসরণে জয়ী কিন্তু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিথারিনী ক্রেসিডা এসে দাঁড়ায় ট্রয়লাসের সামনে। এই চরম সংকটকালে কবি স্বকীয় কাব্যভাবনাকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন— ‘কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়’। কবিতার পরিণতিতে ক্রেসিডার ভুল পথে চলে যাওয়াকে কিংবা মায়া বা প্রবঞ্চনার কথা তুলে ধরতে কবি রামায়ণের মারীচ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন—‘তুমি চলে গেলে মারীচ-মায়াবীর ডাকে মূক বধির ওষ্ঠাধরে’।

বিষ্ণু দে তাঁর ‘ক্রেসিডা’ কবিতায় ভারতীয় মহাকাব্য পুরাণ ও পাশ্চাত্য পুরাণের প্রসঙ্গ ও অনুষ্ঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে মহাযুদ্ধোত্তর সময় পর্বের ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব ও বিপন্নতা, শূন্যতা, প্রেমহীনতা ও বিশ্বাসহীনতাকে তুলে ধরেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথের সন্ধান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—

“একটি পুরাণ কাহিনীকে তার সমকালের দ্বন্দ্বিক উত্তরণের মাত্রা দিয়েছেন। গ্রিক পুরাণের প্রসঙ্গ ও চরিত্রের পাশাপাশি এই কবিতাতে ব্যবহৃত হয়েছে ভারতীয় মহাকাব্য তথা পুরাণের প্রসঙ্গ ও অনুষ্ঙ্গ। ট্রয়লাস, ক্রেসিডা, হেলেন এবং গ্রীস ও ট্রয়ের মহাযুদ্ধের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে কুরুক্ষেত্রের রথচক্র, বেগবান মাতরিশ্বা, ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিত, মারীচ ও ঈশোপনিষদের শব্দানুষ্ঙ্গ।”^৩

বিষ্ণু দে-র ‘ওফেলিয়া’ কবিতাটি শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক ‘হ্যামলেট’-এর অনুসরণে রচিত। মূল নাটকের হ্যামলেট ও তার প্রেমিকা ওফেলিয়ার প্রেমানুভূতিকে আধুনিক যুগচেতনায় রূপায়িত করতে কবি এই কবিতার অবতারণা করেছেন। উল্লেখ্য, শেক্সপিয়ার তাঁর হ্যামলেট নাটকের প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বেলফোরেষ্টের (Belleforest) ফরাসি গল্পগ্রন্থ ‘হিস্টোরিস ট্রাজিকেস’ (Histoires Tragiques) এবং স্যাক্সো গ্রামাটিকাসের (Saxo Grammaticus) ‘হিস্টোরিয়া দানিকা’ (Historia Danica) থেকে। ডেনমার্কের তরুণ পর্ব-২, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৬

যুবরাজ হ্যামলেট পিতার অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরে মাতা গারট্রুড ও খুড়ো ক্লডিয়াসের অবৈধ প্রেম ও তড়িঘড়ি বিয়ের কথা জানতে পারে। পরবর্তীতে মৃত পিতার প্রেতাত্মা এসে মৃত্যুর আসল রহস্য উন্মোচন করলে হ্যামলেট বুঝতে পারে যে, মাতা ও কাকার যৌথ ষড়যন্ত্রেই তার পিতা নিহত হয়েছেন। এই তিক্ত ও নৃশংস অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে হ্যামলেট ওফেলিয়ার সঙ্গেও চরম দুর্ব্যবহার শুরু করে।

কবি তাঁর ‘ওফেলিয়া’ কবিতায় হ্যামলেটের অন্তরের এই চরম বিশ্বাসহীনতা ও বিষাদময় সংশয়কেই কাব্য রূপ দিয়েছেন। সময়ের নির্মম বাস্তবতায় নায়কের হৃদয় আজ তীব্র অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন; সে তার প্রিয়াকে বিশ্বাস করতে চেয়েও আর আস্থা নিতে পারছে না। এই আস্থাহীন ও বঞ্চনাময় জগৎ তার কাছে যেন নরকের ঘোর অন্ধকারের মতোই প্রতীয়মান হয়।

শালতরু হারিয়েছে সাড়।

রক্তহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো। (ওফেলিয়া)

‘হেডিস’ শব্দটি কবি পাশ্চাত্য পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন। গ্রিক পুরাণ অনুসারে ট্রোয়ান পুত্র হেডিস অন্ধকার পাতালপুরীর নিয়ন্তা। পরে হেডিস বলতে বোঝাত মৃতদের পুরী তথা নরক। এখানে নিরঙ্ক ও আর্তনাদে মুখর নরক অর্থেই হেডিসের প্রসঙ্গ এসেছে। কবির চারিদিকের দেশ কাল যেন নরকের প্রতিক্রম বিশ্বাসহীনতায়, বিচ্ছিন্নতায়, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে; তাই তার নায়ক হ্যামলেট ওফেলিয়াকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হ্যামলেট জানে তার মুক্তি প্রেমের মধ্যেই, আর এই প্রেমহীনতার জন্যই তার হৃদয় ব্যথিত। কবিতায় এই নরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা হ্যামলেট এর মধ্যে ধরা পড়েছে। এই অন্ধকার ও বিশ্বাসহীনতাকে বোঝাতে গিয়েই কবি ভারতীয় পুরাণ ও প্রতীচ্যের পৌরাণিক অনুষ্ণকে উপস্থিত করেছেন—

দেবযানী ! সাঝেঁ তোমার প্রণাম মাঝে

ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে

শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার। (ওফেলিয়া)

দেবযানী প্রসঙ্গ ও ক্ষমা, শাপমোচনের সুরভি ইত্যাদি শব্দে ভারতীয় মিথের উত্তরাধিকার থাকলেও রবীন্দ্রনাথের ‘কচ ও দেবযানী’র উত্তরাধিকারই বেশি লক্ষণীয়। আবার—

প্রসার্পিনা কুসুমে ছায়, বৈতরণী পাশে

ছড়ায় আহা!কোমল নীল ঘুমের আবাহন।

লোলুপ তবু দ্বিধায় কার আবির্ভাব-আশে

প্রান্তরের প্রান্তে চায় ভিক্ষু দেহমন। (ওফেলিয়া)

প্রসার্পিনা বা গ্রিকপুরাণে উল্লেখিত পার্সিফোনে মিথটি ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর কন্যা পার্সিফোনে যাকে হেডিস অপহরণ করেছিলেন যখন সে শতপুষ্পশোভিত নার্সিসাস থেকে পুষ্প চয়নে মগ্ন ছিলেন। হেডিস তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় পাতাল রাজ্যে। হ্যামলেট মাঝে মাঝে ওফেলিয়ার প্রেমকে আহ্বান করেছে কিন্তু পরক্ষণেই উদ্বেলিত সন্দেহ ও শোকের আঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। এই নারকীয় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রেম বিশ্বাস এর প্রতিক্রম ওফেলিয়াকে অর্থাৎ এক আলোকোজ্জ্বল ভাবনাকে আহ্বান করেছে।

উদ্ধত প্রেম উদ্ধত হাতে আনো।

সন্ধ্যা আকাশে বৈশাখী হাসে

মরণ মায়াকে হানো। (ওফেলিয়া)

‘যযাতি’ কবিতায় বিষ্ণু দে মাত্র তিন স্তবকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কয়েকটি সামাজিক অসঙ্গতিকে নিখুঁত প্রতীকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। পৌরাণিক রাজা যযাতি নিজের পুত্র পুরুষ যৌবন ঋণ নিয়ে নিজের বার্ধক্যকে নতুন করে ভোগ করতে চেয়েছিলেন। উত্তরকাল বা ভবিষ্যৎকে বঞ্চিত করে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন—সেই পৌরাণিক সূত্রকেই কবি এখানে প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বজুড়ে যে বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয় নেমে এসেছিল, বিষ্ণু দে তাকেই এই কবিতায় ব্যঞ্জিত করেছেন। মহাভারতের আখ্যানে যক্ষের ধাঁধার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে পাণ্ডবদের যেমন সাময়িক মৃত্যু মেনে নিতে হয়েছিল, কবি এখানেও ঠিক সেইরূপ রূপক ব্যবহার করেছেন। “অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে”— এই চিত্রকল্পটির মধ্য দিয়ে কবি যযাতির মতো জরাজীর্ণ ও প্রাচীন ধনতন্ত্রকে যক্ষের প্রতীকে তুলে ধরেছেন। কবি মনে করেন, এই জরাজীর্ণ ব্যবস্থা প্রগতিশীল ও তরুণ সমাজভাবনাকে অস্বীকার বা আড়াল করতেই উদ্যত হয়েছে।

প্রসার্পিনার মুঠিতেই তাই প্রণয় রতি

পিতৃসারস যযাতি শিরার প্রবল গানে। (যযাতি)

এছাড়াও এ কাব্যের অন্য যে কবিতাগুলির মধ্যে মিথ পুরাণের অভিঘাত অল্প বিস্তর অনুভব করা যায় সেগুলোর মধ্যে ‘মহাশ্বেতা’, ‘শিখন্ডীর গান’, ‘প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে পরাধীন জন্মভূমি, ক্লান্তির একঘেয়েমী, বিচ্ছিন্নতাবোধ, মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থপরতা, বিশৃঙ্খল জীবন যাত্রার পরিবেশ; এবং তারই প্রকাশ ঘটেছে ‘ঘোড়সওয়ার’, ‘টপা ঠুংরি’, ‘বেকার বিহঙ্গ’, ‘প্রভৃতি কবিতায়। কবি সমকালীন নেতির শূন্যতাকে অর্থাৎ সমস্ত অন্ধকারময়তা থেকে উত্তরণের জন্য একটা positiveness এর দিকে যাত্রা করেছেন, এবং তাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন পুরাণের বিভিন্ন অনুষ্ঙ্গ। যেমন: মৃগতৃক্ষিকা দূর দিগন্তে ডাকি? positiveness কে পাবার আকাঙ্ক্ষাতেই ঘোড়সওয়ারকে আহ্বান করেছেন। যাকে কখনো মনে হয়েছে বিপ্লব, কখনো মনে হয়েছে প্রেমিক পুরুষ আবার কখনো ভগবান, যে কবিকে মুক্তির পথ দেখাবে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবে, বৈতরণী পার করাবে।

আবার সমসাময়িক জীবনে গ্লানির রূপ ফুটে উঠেছে ‘টপা ঠুংরি’ কবিতায়। নগর কেন্দ্রিক যান্ত্রিকতা ক্লান্তি এবং একঘেয়েমি বোঝাতে কবি মিথের শব্দানুষ্ঙ্গ ব্যবহার করেছেন—

ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া

তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর

ট্যাক্সির হৃদস্পন্দে ট্রাফিকের এটাকশিয়ায়”। (টপা-ঠুংরি)

সবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রোত্তর যুগের আধুনিক কবিদের মধ্যে পুরাণ ও মিথ ব্যবহারে বিষ্ণু দে এক অনন্য স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক ও মানসিক বিপর্যয় এবং তীব্র যুগচেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিথকে নতুন মাত্রায় রূপায়িত করেছেন। এভাবে পুরাণের এক নবজন্ম ঘটিয়ে সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি রূপ দিয়েছেন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। ‘বিষ্ণু দে: জীবন ও সাহিত্য’। পুরান ঐতিহ্য ও বিষ্ণু দে,’ দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ: ১৭৭।

২. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া'। 'বিষ্ণু দে-র কবিতা: মিথ-পুরাণের গ্রন্থিবন্ধন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ: ৮২।
৩. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। 'বিষ্ণু দে: কবিতার নিবিড় পাঠ'। 'ক্রেসিডা: বিশ্বাস ভঙ্গ ও প্রত্যাখ্যান থেকে প্রাপ্ত উত্তরণে', রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ: ৫৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দে, বিষ্ণু। চোরাবালি। ভারবি, কলকাতা।
২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরাণ ও মিথ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩. বসু, বুদ্ধদেব। কবিতার কথা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪. নন্দী, শঙ্খ। আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।